70438 - হায়েয বা মাসিকের বিধি-বিধান

প্রশ্ন

নারীর হায়েয বা মাসিক চলাকালীন পালনীয় বিধানসমূহ কী কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

হায়েয বা মাসিকের সাথে সম্পৃক্ত বিধি-বিধান অনেক। যার সংখ্যা বিশেরও অধিক। এর থেকে আমরা সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বিধানগুলো উল্লেখ করব:

এক. নামায:

হায়েযগ্রস্ত নারীর জন্য ফরয বা নফল সব ধরনের নামায পড়া নিষিদ্ধ। যদি সে নামায আদায় করে তাহলে তা শুদ্ধ হবে না। মাসিক অবস্থায় তার উপর নামায ফরযও নয়। তবে মাসিক শুরু হওয়ার আগে অথবা মাসিক শেষ হওয়ার পর যদি কোনো ওয়াক্তের এক রাকাত নামায পড়ার মতো সময় পাওয়া যায়, তাহলে ঐ ওয়াক্তের নামায তার উপর ফরয হবে।

ওয়াক্তের শুরুর উদাহরণ: সূর্যাস্তের পর এক রাকাত পড়ার মতো সময় পাওয়ার পর মাসিক শুরু হলে, পবিত্র হওয়ার পর মাগরিবের সেই সালাত কাযা করতে হবে। যেহেতু তিনি মাসিক শুরু হওয়ার আগে মাগরিব এক রাকাত নামায পড়ার মত ওয়াক্ত (সময়) পেয়েছিলেন।

ওয়াক্ত শেষের উদাহরণ: কোনো নারী সূর্যোদয়ের আগে এক রাকাত নামায পড়া যায় এ পরিমাণ সময় থাকতে যদি হায়েয থেকে পবিত্র হন তাহলে গোসল করার পর তাকে ফজরের নামায কাযা করতে হবে। কারণ তিনি ফজরের নামাযের ওয়াক্তের এমন একটি অংশ পেয়েছিলেন যা এক রাকাত পড়ার জন্য যথেষ্ট।

কিন্তু, এক রাকাআতের চেয়ে কম সময় পেলে নামায কাযা করা ফরয হবে না। যেমন: প্রথম উদাহরণে যদি সূর্যাস্তের এক মুহূর্ত পরে তার হায়েয শুরু হয় অথবা দ্বিতীয় উদাহরণে সূর্যোদয়ের এক মুহূর্ত আগে যদি সে পবিত্র হয়, তাহলে তার উপরে সংশ্লিষ্ট নামায আবশ্যক হবে না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘যে ব্যক্তি নামাযের এক রাকাত পেয়েছে, সে পুরো নামাযই পেয়েছে।’[বুখারী ও মুসলিম] এ কথার পরোক্ষ মর্ম হলো কেউ যদি এক রাকাতের কম সময় পায়, তাহলে সে নামায পায়নি।

হায়েযগ্রস্ত মহিলার যিকির করা, তাকবীর বলা, তাসবীহ পাঠ করা, আল্লাহর প্রশংসা করা, খাওয়া-দাওয়াসহ যে কোনো কাজে বিসমিল্লাহ বলা, হাদীস ও ফিকহ পাঠ করা, দোয়া করা, দোয়ায় আমীন বলা এবং কুরআন শরীফ শ্রবণ করা ইত্যাদি কোনোটেই হারাম নয়। কেননা সহীহ বুখারী ও মুসলিমসহ অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত আছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হায়েয চলাকালীন তার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন।

সহিহ বুখারী ও মুসলিমে আছে: উম্মু আত্বিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন: “নবযৌবনা, বিবাহযোগ্য ও হায়েযগ্রস্ত মেয়েদেরকে নিয়ে যাবে অর্থাৎ দুই ঈদের নামাযের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাবে। তারা কল্যাণকর কথা-কাজ ও মুমিনদের দোয়ায় উপস্থিত হবে। আর হায়েযগ্রস্ত নারীরা নামাযের স্থান থেকে দূরে থাকবে।”

হায়েযগ্রস্ত মহিলার কুরআন তিলাওয়াত করার হুকুম হলো যদি শুধু চোখ দিয়ে দেখে কিংবা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা ছাড়া শুধু অন্তর দিয়ে চিন্তাভাবনা করে তাহলে এতে কোনো অসুবিধা নেই। সেটা এভাবে যেমন: চোখের সামনে কুরআনগ্রন্থ বা কুরআন সম্বলিত বোর্ড খুলে রাখা হলো হায়েযগ্রস্ত নারী আয়াতগুলো দেখে মনে মনে পড়লেন। ইমাম নববী শারহুল মুহাযযাব গ্রন্থে বলেছেন: এটি জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই।

অন্যদিকে যদি জিহ্বা দিয়ে উচ্চারণ করে পড়া হয়, তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মতে এটি নিষিদ্ধ ও নাজায়েয।

বুখারী, ইবনে জারীর ত্বাবারী ও ইবনুল মুনযির বলেন: এটি জায়েয। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈর (পুরাতন অভিমতের) থেকেও জায়েয বর্ণিত আছে। বর্ণনাটি উল্লেখ করা হয়েছে ফাতহুল বারীতে। সহিহ বুখারীতে ইবরাহীম নাখঈর (সনদবিহীন) উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে: 'হায়েযগ্রস্ত নারীর জন্য কুরআনের আয়াত পড়তে কোনো অসুবিধা নেই'।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ‘ফাতাওয়া’-তে বলেন: “হায়েযগ্রস্ত নারীর জন্য কুরআন তিলাওয়াত করা নিষিদ্ধ— এ ব্যাপারে কোনো প্রমাণ নেই। কেননা ‘হায়েযগ্রস্ত নারী ও জানাবতগ্রস্ত ব্যক্তি (যার উপর গোসল ফরয) কুরআন থেকে কিছুই পড়তে পারবে না’ বলে যে হাদীসটি রয়েছে হাদীসবিদ আলেমদের সর্বসম্মতক্রমে সেটি দুর্বল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেও নারীদের হায়েয হত। এখন যদি এই হায়েযের কারণে নামাযের মত কুরআন তিলাওয়াতও তাদের জন্য হারাম হয়ে থাকত তাহলে নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মাহর জন্য তা বর্ণনা করতেন। তাঁর পবিত্র স্ত্রীদেরকে এ ব্যাপারে শিক্ষা দিতেন এবং কেউ না কেউ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণনা করতেন। কিন্তু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হায়েযগ্রস্ত নারীর কুরআন তিলাওয়াত হারাম হওয়া প্রসঙ্গে কেউই কোনো কিছু বর্ণনা করেননি। সুতরাং এটিকে হারাম বলে গণ্য করা জায়েয হবে না। উল্লেখ্য, যে তিনি এর থেকে নিষেধ করেননি। যেহেতু তার সময়েও হায়েযগ্রস্ত বহু নারী থাকার পরও তিনি নিষেধ করেননি সেহেতু জানা গেল যে এটি হারাম নয়।”[সমাপ্ত]

এ প্রসঙ্গে আলেমদের বিভিন্ন মত সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর এখন এটিই বলা উচিত হবে যে, হায়েযগ্রস্ত নারীর জন্য বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া উচ্চারণ করে কুরআন তিলাওয়াত না করাই উত্তম। তবে বিশেষ প্রয়োজন হলে, যেমন: শিক্ষিকা ছাত্রীদেরকে মুখে উচ্চারণ করে কুরআন শরীফ পড়ানো অথবা পরীক্ষার্থী ছাত্রী পরীক্ষা দিতে গিয়ে প্রয়োজনের তাগিদে মাসিক অবস্থায়ও কুরআনের আয়াত পড়তে পারবে কিংবা এ ধরণের অন্য কোন প্রয়োজনে।

দুই. রোযা:

হায়েযগ্রস্ত নারীর জন্য ফরয-নফল সব ধরনের রোযা রাখা হারাম। রোযা রাখলে সেটি বিশুদ্ধ হবে না। কিন্তু ফরয রোযার কাযা করা তার উপর ওয়াজিব। কারণ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “আমাদের যখন মাসিক হত, তখন আমাদেরকে শুধু রোযার কাযা করার নির্দেশ দেওয়া হত। কিন্তু নামাযের কাযা করার নির্দেশ দেওয়া হত না।’[বুখারী ও মুসলিম]

রোযা অবস্থায় হায়েয (রক্তস্রাব) শুরু হলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে, যদিও সেটি সূর্যাস্তের সামান্য আগে হয়ে থাকে। ঐ রোযা ফরয হয়ে থাকলে কাযা করা ওয়াজিব। আর রোযাদার নারী যদি রোযা অবস্থায় সূর্যাস্তের আগে রক্তস্রাব স্থানান্তরিত হওয়া অনুভব করে, কিন্তু সূর্যাস্তের পর রক্তস্রাব বের হয়, তাহলে উক্ত নারীর রোযা পূর্ণ হয়ে যাবে এবং বিশুদ্ধ মত অনুসারে রোযা নষ্ট হবে না। কারণ ভেতরে থাকা রক্তের সাথে কোনো হুকুম প্রযোজ্য নয়। এর পক্ষে প্রমাণ হলো: যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়: পুরুষ লোক যা স্বপ্নে দেখে একজন মহিলাও যদি তা দেখে তাহলে তার উপর কি গোসল করা ফরয? তিনি উত্তরে বলেন: “হ্যাঁ, যদি সে বীর্য দেখতে পায়।” উক্ত হাদীসে গোসল ফরয হবে কিনা এই হুকুমটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বীর্য দেখার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন; বীর্য স্থানান্তরিত হওয়ার সাথে নয়। অনুরূপ কথা হায়েযের ক্ষেত্রেও বলা যায় যে, বের না হওয়া তথা না দেখা যাওয়া পর্যন্ত হায়েযের বিধি-বিধান কার্যকর হবে না।

হায়েয অবস্থায় যদি ফজর হয়ে যায় তাহলে তার সেদিনের রোযা সঠিক হবে না। এমনকি যদি ফজর হওয়ার এক মুহূর্ত পরেই সে পবিত্র হয়ে যায়।

ফজর হওয়ার আগে যদি সে পবিত্র হয় তাহলে তার রোযা সঠিক হবে; যদিও সে ফজরের পরে গোসল করে থাকে। তার উদাহরণ জানাবত (বড় অপবিত্রতা) অবস্থায় থাকা ব্যক্তির মত যে অপবিত্র অবস্থায় রোযার নিয়ত করেছে। আর সে গোসল করেছে ফজর হওয়ার পর। এমন ব্যক্তির রোযাও সঠিক। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নদোষে নয়; বরং সহবাসের কারণে জুনুবী অবস্থায় ভোরে (ফজরে) উপনীত হতেন। তারপর রমযানের রোযা রাখতেন।”[বুখারী ও মুসলিম]

তিন. কাবাঘর তাওয়াফ করা:

ঋতুবতী নারীর জন্য কাবাঘরের ফরয ও নফল উভয় প্রকার তাওয়াফ করা হারাম। যদি সে তাওয়াফ করে তাহলে বিশুদ্ধ হবে না। এর পক্ষে দলীল হচ্ছে: আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার যখন মাসিক হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন: “পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তুমি কাবাঘরের তাওয়াফ ছাড়া সাধারণ হাজীর মত সব কাজ করে যাও।” হজ্জ ও উমরার অন্যান্য কাজ যেমন: সাফা-মারওয়ার মাঝে দৌঁড়ানো, আরাফার ময়দানে অবস্থান, মুযদালফা ও মিনায় রাত্রিযাপন এবং জামরায় কংকর নিক্ষেপে ইত্যাদি হারাম নয়। সুতরাং কোনো মহিলা যদি পবিত্র অবস্থায় তাওয়াফ করেন এবং তাওয়াফ শেষে করা মাত্র তার মাসিক শুরু হয়ে যায় অথবা সাফা-মারওয়ার মাঝে দৌঁড়ানোর সময় তার মাসিক দেখা দেয়, তাহলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

চার. ঋতুবতী নারীর জন্য বিদায়ী তাওয়াফ নেই:

হজ্জ ও উমরার কাজগুলো শেষে করার পর নিজ দেশে রওনা হওয়ার আগে যদি মহিলার মাসিক শুরু হয় এবং রওনা হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, তাহলে বিদায়ী তাওয়াফ ছাড়াই তিনি মক্কা ত্যাগ করবেন। এর পক্ষে দলীল হচ্ছে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন: ‘সকল হাজীকে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের শেষে কাজ যেন কাবাঘরের তাওয়াফ দিয়েই হয়। কিন্তু ঋতুবতী নারীর জন্য এই আদেশ শিথিল করা হয়েছে।”

তবে হজ্জ ও উমরার তাওয়াফ থেকে ঋতুবতী নারী অব্যাহতি পাবে না। বরং পবিত্র হওয়ার পর তাকে তাওয়াফ করতে হবে।

পাঁচ. মসজিদে অবস্থান:

ঋতুবতী নারীর জন্য মসজিদে অবস্থান করা হারাম। এমনকি ঈদগাহের নামায পড়ার স্থানেও সে অবস্থান করতে পারবে না। কারণ উম্মে আত্বিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি বলতে শুনেছেন: ‘নবযৌবনা, বিবাহযোগ্য ও হায়েযগ্রস্ত নারীরা যেন (ঈদের উদ্দেশ্যে) বের হয়।” উক্ত হাদীসে আরো আছে: “হায়েযগ্রস্ত নারীরা যেন নামাযের স্থান থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখে।’[বুখারী ও মুসলিম]

ছয়. স্ত্রী সহবাস:

হায়েযে চলাকালীন স্ত্রী সহবাস করা স্বামীর জন্য হারাম। অনুরূপভাবে ঐ অবস্থায় স্বামীকে মিলনের সুযোগ করে দেওয়াও স্ত্রীর জন্য হারাম। কেননা আল্লাহ তাআলা বলছেন:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ

‘তারা তোমাকে হায়েযে সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তুমি বলে দাও, এটি কষ্টদায়ক (বা কদর্য বস্তু)। কাজেই তোমরা হায়েযে অবস্থায় স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকো এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের কাছে যাবে না।’[সূরা বাকারা:

২২২]

উক্ত আয়াতে محيض (মাহীয) বলতে হায়েযের সময় বোঝানো হয়েছে। আর এর স্থান হচ্ছে নারীর লজ্জাস্থান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা সহবাস ছাড়া আর সব কিছু করতে পারো।"[হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেন]

হায়েযগ্রস্ত নারীর লজ্জাস্থানে সহবাস করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে মুসলিমদের ইজমা (ঐক্যমত্য) রয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ, স্বামীর জন্য সহবাস ছাড়া উত্তেজনা নিবারণ করা যায় এমন সকল কিছু স্ত্রীর সাথে করা জায়েয করা হয়েছে। যেমন: চুম্বন, আলিঙ্গন এবং লজ্জাস্থান ছাড়া অন্যান্য অঙ্গের মাধ্যমে শৃঙ্গার করা। কিন্তু উত্তম হচ্ছে কোনো আবরণ ছাড়া নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশে শৃঙ্গার না করা। কারণ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিতেন যেন আমি ঋতুবতী অবস্থায় শরীরের নিম্নাংশের কাপড় পরি, তারপর তিনি আমার সাথে শৃঙ্গার করতেন।[হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন]

সাত. তালাক:

হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া স্বামীর জন্য হারাম। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

"হে নবী, তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও, তখন তাদেরকে ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দাও।"[সূরা তালাক: ১]

অর্থাৎ এমন সময়ে তালাক দিবে যাতে করে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তালাকের পর নির্দিষ্ট ইদ্দত গণনা করতে পারে। আর এটা গর্ভবতী অবস্থায় অথবা সঙ্গমবিহীন পবিত্রতার সময়ে তালাক দেওয়া ছাড়া সম্ভব নয়। কারণ হায়েয চলাকালীন তালাক দেওয়া হলে স্ত্রী ইদ্দত গণনা করতে পারবে না। কেননা যে হায়েযের মাঝে তাকে তালাক দেওয়া হয়েছে সেটি তো ইদ্দতের মাঝে গণ্য হবে না। অনুরূপভাবে যদি পবিত্রতার অবস্থায় সঙ্গমের পর তালাক দেওয়া হয়, তখনও ইদ্দতকাল নির্দিষ্ট করা সম্ভব হবে না। কারণ এই সঙ্গমের মাধ্যমে স্ত্রী গর্ভবতী হওয়া কিংবা না হওয়ার বিষয়টি অজানা থেকে যাবে। যদি গর্ভবতী হয়ে থাকে, তাহলে জন্ম দেওয়ার মাধ্যমে ইদ্দত গণনা করবে। আর যদি গর্ভবতী না হয়ে থাকে তাহলে হায়েযের মাধ্যমে ইদ্দত গণনা করবে। যেহেতু ইদ্দতের প্রকার নিশ্চিতভাবে জানা নেই, তাই বিষয়টি স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তালাক দেওয়া হারাম হবে।

উপর্যুক্ত আয়াতের কারণে হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম। আরো একটি দলীল হচ্ছে সহিহ বুখারী ও মুসলিমসহ

অন্যান্য গ্রন্থে ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেন। উমর এই খবরটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিলে তিনি বলেন: "তুমি তাকে নির্দেশ দাও যেন সে তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয় এবং পবিত্র হওয়া পর্যন্ত নিজের কাছে রেখে দেয়। তারপর পুনরায় যখন তার হায়েয হবে এবং সেই হায়েয থেকে সে পবিত্র হবে, তখন চাইলে সে নিজের কাছে রেখে দিবে কিংবা চাইলে সঙ্গমের আগেই তাকে তালাক দিবে। আর এটাই হচ্ছে সেই ইদ্দত যার প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহ নারীদেরকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।"

কোনো পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় তালাক দেয় তাহলে সে পাপী। তাকে আল্লাহর কাছে তাওবা করতে হবে এবং স্ত্রীকে তার কাছে ফিরিয়ে নিতে হবে। তারপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী শরয়ি তালাক প্রদান করবে। সে জন্য তাকে ফিরিয়ে আনার পর হায়েয থেকে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত রেখে দিবে। তারপর আবার তার হায়েয হবে। এরপর সে পবিত্র হলে চাইলে তাকে সে রেখে দিবে, আর চাইলে তার সাথে সহবাসের আগে তাকে তালাক দিয়ে দিবে।

হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম। তবে তিন অবস্থায় সেটি জায়েয:

এক: বিয়ের পর স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে নির্জনে একত্রিত হওয়া (বাসর করার) আগেই অথবা বিবাহের পর সহবাসের আগেই হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় তালাক দেয় তাহলে তা হারাম নয়। এ অবস্থায় স্ত্রীর উপর কোনো ইদ্দত পালন ওয়াজিব নয়। সুতরাং এই ক্ষেত্রে তালাক প্রদান করা আল্লাহর নির্দেশ "তোমরা তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দিবে" এর পরিপন্থী নয়।

দুই: যদি গর্ভবতী অবস্থায় হায়েয হয়ে থাকে।

তিন: যদি কোনো কিছুর বিনিময়ে তালাক হয়ে থাকে। এ অবস্থায় হায়েয চলাকালেও তালাক দিতে কোনো সমস্যা নেই।

নারীর জন্য ঋতুবতী থাকা অবস্থায় বিয়ে করতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ এক্ষেত্রে মূল অবস্থা হলো: বৈধতা। এই বৈধতাকে নাকচকারী কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু, হায়েয অবস্থায় স্ত্রীকে স্বামীর কাছে পাঠানোর (বাসর করানোর) ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে স্বামী সঙ্গম থেকে বিরত থাকতে পারবে কিনা; যদি থাকতে পারে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। আর যদি সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে; তাহলে পবিত্র হওয়ার আগে স্বামীকে স্ত্রীর কাছে পাঠানো (বাসর করা) যাবে না।

আট. হায়েযের মাধ্যমে তালাক গণনা করা:

কোনো পুরুষ যদি স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা কিংবা নির্জনে একত্র হওয়ার (বাসরের) পর তাকে তালাক দেয়, তাহলে তার জন্য তিনটি পূর্ণাঙ্গ হায়েযের মাধ্যমে ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব; যদি ঐ নারী ঋতুবতী মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং গর্ভবতী না হয়। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“তালাকপ্রাপ্তা নারী তিন হায়েয পর্যন্ত নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে।”[সূরা বাকারা: ২২৮] আর যদি স্ত্রী গর্ভবতী হয়, তাহলে গর্ভের সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তার ইদ্দত; সেই সময়কাল দীর্ঘ হোক কিংবা সংক্ষিপ্ত হোক। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“গর্ভবতী নারীদের ইদ্দত সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত।”[সূরা তালাক: ৪]

আর যদি তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী ঋতুবতী নারীদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকে, যেমন: অতিবয়স্কা নারী যার বয়সের কারণে হায়েযের সম্ভাবনা নেই অথবা অস্ত্রোপচারের কারণে গর্ভাশয় নষ্ট হওয়ায় হায়েয আসছে না; তাহলে তার ইদ্দত তিন মাস। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ

“তোমাদের স্ত্রীদের মাঝে যাদের ঋতুবতী হওয়ার আশা নেই তাদেরকে নিয়ে সন্দেহ হলে (হায়েয দিয়ে ইদ্দত গণনা করা সম্ভব না হলে) তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস। এছাড়া যারা এখনো হায়েযের বয়সে পৌঁছেনি তাদের ইদ্দতকালও অনুরূপ।”[সূরা তালাক: ৪]

আর ঋতুবতী নারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও যে সমস্ত মহিলার নির্দিষ্ট কোনো কারণে যেমন: অসুস্থতা বা দুগ্ধ পান করানোর ফলে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত হায়েয হয় না, তারা ইদ্দত পালন করে যাবে। যদিও সেই ইদ্দতকাল দীর্ঘ হয়। যখন রক্তস্রাব শুরু হবে তখন ইদ্দত গণনা শুরু করবে। যদি নির্দিষ্ট কারণটি শেষ হওয়ার পরও রক্তস্রাব না আসে যেমন: রোগ থেকে মুক্ত হয়েছে কিংবা দুধ পান করানো শেষ হয়েছে, অথচ হায়েয বন্ধ হয়েই আছে তাহলে কারণটি শেষ হওয়ার পর থেকে এক বছর ইদ্দত পালন করবে। এটি সঠিক অভিমত, যে মতটি শরীয়তের নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা নির্দিষ্ট কারণ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও হায়েয না আসা বিনা কারণে হায়েয বন্ধ থাকার মতোই। আর কোনো নির্দিষ্ট কারণ ছাড়া হায়েয বন্ধ থাকলে পূর্ণ এক বছর ইদ্দত পালন করতে হয়। তন্মধ্যে নয় মাস গর্ভের কারণে সতর্কতাবশতঃ, আর আর তিন মাস ইদ্দতের কারণে।

আর যদি বিবাহের পর সহবাস করা অথবা স্বামী-স্ত্রী নির্জনবাস (বাসর) করার আগেই তালাক দেওয়া হয়, তাহলে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হবে না। হায়েযের মাধ্যমেও না; অন্য কোনো কিছুর মাধ্যমেও না। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন নারীদেরকে বিয়ে ও স্পর্শ করার (সহবাস করার) পূর্বে তালাক দিলে তোমাদের জন্য তাদের পালনীয় কোনো ইদ্দত নেই যা তোমরা গণনা করবে।”[সূরা আহযাব: ৪৯]

নয়. গর্ভাশয় সন্তান থেকে মুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত:

অর্থাৎ গর্ভাশয়ে সন্তান না থাকা। যখনই গর্ভাশয় খালি থাকার বিষয়ে শরয়ি সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয়, তখন এ বিষয়টি বিবেচ্য হয়। এ সংক্রান্ত কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

ক. যদি কোনো ব্যক্তি এমন কোনো সধবা নারীকে রেখে মারা যায় যার গর্ভে সন্তান থাকলে মৃতের উত্তরাধিকারী হবে তাহলে ঐ নারীর স্বামী তার হায়েয হওয়ার আগে বা তার গর্ভধারণ স্পষ্ট হওয়ার আগে তার সাথে সহবাস করবে না। যদি তার গর্ভধারণ স্পষ্ট হয় তবে আমরা সেই সন্তানের উত্তরাধিকার সাব্যস্ত করব। যেহেতু আমরা সিদ্ধান্ত দিয়েছি যে উত্তরাধিকারদাতার মৃত্যুর সময় তার অস্তিত্ব ছিল। আর যদি ঐ নারীর হায়েয হয়ে যায় তবে আমরা উত্তরাধিকারকে নাকচ করব। যেহেতু আমরা হায়েয হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে গর্ভাশয়ে কোনো সন্তান না থাকার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।

দশ. গোসল ওয়াজিব হওয়া:

হায়েয থেকে পবিত্র হলে নারীর উপর সম্পূর্ণ শরীর পবিত্র করে গোসল করা ফরয। এর প্রমাণ হচ্ছে ফাতিমা বিনতে আবি হুবাইশ রাদিয়াল্লাহু আনহাকে লক্ষ্য করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: ‘যখন হায়েয শুরু হবে তখন নামায পড়বে না। আর যখন হায়েয শেষ হবে তখন গোসল করবে এবং নামায আদায় করবে।’[হাদীসটি বুখারী বর্ণনা করেন]

গোসলের ন্যূনতম ফরয হলো, চুলের গোড়াসহ সম্পূর্ণ শরীরে পানি পৌঁছানো। আর উত্তম হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত পদ্ধতিতে গোসল করা। আসমা বিনতে শাকল রাদিয়াল্লাহু আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হায়েযের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করলে তিনি বলেন: “তোমাদের কেউ তার পানি ও বরই পাতা দিয়ে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে। তারপর মাথায় পানি ঢেলে ভালোভাবে ঘষবে, যাতে চুলের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছে। এরপর সারা শরীরে পানি ঢালবে। তারপর মেশকযুক্ত কাপড়ের একটি টুকরা নিয়ে তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে।” আসমা জিজ্ঞেসে করলেন: ‘মেশক দিয়ে কীভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে?’ তিনি বললেন: “সুবহানাল্লাহ!” তখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন: “রক্তের চিহ্নের স্থান অনুসরণ করবে।”[হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেন]

মাথার চুল খুলে দেওয়া ফরজ নয়; তবে যদি চুল খুব শক্ত করে বাঁধা থাকে এবং পানি চুলের গোড়ায় পৌঁছাবে না বলে আশঙ্কা হয়; তাহলে খুলতে হবে। সহিহ মুসলিমে উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেসে করলেন: ‘আমি আমার চুল শক্ত করে বাঁধি; জানাবাতের গোসলের জন্য কি তা খুলতে হবে?’ অন্য

বর্ণনায় আছে: 'হায়েয ও জানাবাতের জন্য?' তিনি বললেন: "না। তোমার জন্য যথেষ্ট হলো: মাথার ওপর তিন মুঠো পানি ঢেলে নেওয়া, তারপর সারা শরীরে পানি ঢালা। এভাবেই তুমি পবিত্র হয়ে যাবে।"

আর যদি কোনো নারী নামাযের ওয়াক্ত থাকতে হায়েয থেকে পবিত্র হয় তাহলে তার উপর ফরয হলো দ্রুত গোসল করা যাতে করে ওয়াক্তের মধ্যে নামায পড়তে পারে। যদি সে সফরে থাকে এবং তার কাছে পানি না থাকে, অথবা পানি থাকলেও ব্যবহার করলে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে কিংবা যদি অসুস্থ হয় এবং পানি ব্যবহার করা তার জন্য ক্ষতিকর হয়; তাহলে সে গোসলের বদলে তায়াম্মুম করবে। প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যাওয়ার পর গোসল করবে।

কিছু নারী আছে যারা নামাযের ওয়াক্ত থাকতে হায়েয থেকে পবিত্র হলেও দেরীতে অন্য ওয়াক্তে গিয়ে গোসল করে। তারা এই কথা বলে যে এই সময়ের মধ্যে পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু, এটি কোনো দলীল বা ওজর নয়। কারণ সে গোসলের ন্যূনতম ফরয আদায় করে ওয়াক্তের মধ্যে নামায আদায় করতে পারে। পরে সুযোগ পেলে পূর্ণ পদ্ধতিতে গোসল করতে পারে।"[সমাপ্ত]

এগুলো নারীর হায়েযের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান বিধান।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহুর রচিত رسالة في الدماء الطبيعية للنساء